কবি

লিটিল কবিতাপত্র

<u>শুরু সংখ্যা</u>

জুলাই'২০২১

সম্পাদক
র. আমিন

প্রচ্ছদ
জয়নুল আবেদিন

প্রকাশক
Amazon.com Inc., USA

কাজী শামীম মাহমুদ - ০৩
চূড়া

আবুল কালাম আজাদ – ০৪
প্রলয়কামী
জগতের রূপ
ভোরের বর্ণমালা
বোন

কাজী তানভীর আনজুম (মিরা) - ০৬
ভালোবাসা
ছড়া
শুভ সকাল

মাহমুদা আঞ্জুমান - ০৯
হেমন্ত লক্ষ্মী
ছড়া
পথ শিশু
হে মানুষ!
ভালেবাসা মানে

Sabila Rawshan - ১২
পাইনা খুঁজে

Mahabubur Rahim - ১২
কবিতা

Kazi Saif Uddin Ratan - ১৩
DOUBT
FAIR
THINKING
ONCE

সৈয়দ আহসান কবীর - ১৬
লাশ হতে কতো বাকি
কলমের জবান খুলে দাও

র.আমিন - ১৭
কবিতা
ভালোবাসা দিবস
'বনলতা সেন' আসলে কে ছিলেন ?

কাজী শামীম মাহমুদ

চূড়া
কি যেন ভাবছি ?
কি যেন করছি ?
স্বপ্নে শরৎ মেঘের বেলায়।
রবি বাহারি রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দেয়
রূপময় হিমালয় কন্যাকে।
সারি সারি আলপাইন গাছের
মিলন মেলায় হারিয়ে যাই স্বপ্নের মল চূড়ায়
মেঘে মেঘে পথ চলা লামা হাট্টা
ঝিক ঝিক ছন্দে চলেছে
টয় রেল ঘোম থেকে বাতাসিয়ালোপে
দূরবিনে দেখা মেলে কাঞ্চন জঙ্ঘা
বধূয়ার হাতে হাত রেখ
কথা বলি স্বপনে মেঘমালায়।

কথাদেবী
শেষলগ্নে দাড়িয়ে
জীবন যৌবনের সন্ধিক্ষণে
নীলগিরির নীলিমায় –
আহ্বান করি কথাদেবীর
চঞ্চলার ব্যাকুল হৃদয়ে ।
চোখ কথা বলে-কথার ছলে
শর্শীঘাটের দীপালী ঊর্মিতে ।
অবুঝ হৃদয়-রক্তাক্ত
হয়ে উঠে- দেবার হাতছানিতে ।
ঢের বছর পেরিয়ে-হৃদয়
আজ পাপিষ্ঠ আত্মার দখলে,
দিপালী দীঘিতে সাঁতার কাটি
পাপিষ্ঠ আত্মার মুক্তির দাবিতে
রাজবাড়ী লাল হয়ে উঠে
দিপালী ছন্দের মাধুলিয়ায়
ইন্দ্রোপুরে নীলললনা-
বাসর সাঁজায়-কথাদেবীর
হৃদয়ের রাজমহলে ।

আবুল কালাম আজাদ

প্রলয়কামী
সক্ষমতা কমে গেছে কবেই
এখন যান্ত্রিক
কুসংস্কার ছাড়েনি পিছু,ভরসা তান্ত্রিক।
অশ্বারোহী মরে গেছে কবেই
এখন স্টিয়ারিং
একদা এক রাজা ছিলো,এখন সবাই কিং।
কামারশালায় নেই মনোযোগ
সতত প্লাস্টিক
গড্ডলিকাপ্রবাহে এখন চলেছে সামষ্টিক।
খাঁটি ও আসল ভুলেছে কবেই
ভেজাল মনপ্রাণ
জানিনা কোন প্রলয় শেষে আসবে পরিত্রাণ।

জগতের রূপ
ক্যাফেটিরিয়ায় ধূমায়িত কফি
আড্ডায় জমে কথা
বন্ধু নিয়ে পথ চলবার
যেথায় যথাতথা।
হঠাৎ সামনে মায়াবী চোখের
লাজুক গ্রাম্য মেয়ে
জগতের রূপ আসমান থেকে
নেমে আসে- দেখি চেয়ে।
ফসলের জমি পিতৃভূমি
শ্যামলে মুগ্ধ মন
মায়ের মুখে ঘুমপাড়ানিয়া
গল্প সাতকাহন।
বাঁচি ও বাঁচাই স্বপ্ন সাজাই
এ জগত মধুময়
মরবো জেনেও এখানেই প্রেম
অঙ্কুরিত নির্ভয়।

ভোরের বর্ণমালা
অ আ বলতেই
মনজুড়ে একুশ নাচে ছন্দে-আনন্দে
ভোরের পাখিরা ডাকে
উত্তাল রৌদ্রমিছিলে প্রবল বৈশাখে।
যত আসে ঝড়-জলোচ্ছ্বাস
মহামারী ও সংকট
যত আসে জীবিকায় টানাপোড়েন
তত জ্বলে উঠে প্রত্যয়ে মানুষের মন
ভাঙনেও সে নির্মাণে সুদৃঢ় সম্মোহন।
এই দেশ এই আবহমান বাংলাদেশ
বর্ণমালার অবিরাম বিশ্বাসে
সুন্দরবন আর বঙ্গোপসাগর ছুঁয়ে
জীবনের দৈনিকে সুখবর নিয়ে আসে।

বোন
দিলি প্রথম পাকা আমটাও
লাল চুড়িটার পুরো দামটাও
তুই যে আমার বোন
ছোট্ট বেলার খুনসুটি আর
গল্প সাত কাহন।
প্রথম তোর আঙুল ছুঁয়ে
দাঁড়াই হাঁটবো বলে
তোর কাছে শেখা কথার গাঁথুনি
চাঁদ দেখাবার ছলে।
প্রথম তোর পড়া শুনে শুনে
শুরু বইয়ের পাঠ
আঁকতে থাকি তোর তুলিতে
ফুল ফসলের মাঠ।
বৈশাখে তোর হাত ধরে ধরে
মেলার বায়োস্কোপে
জেনেছি রূপকথাদের মাঝে
রাক্ষস থাকে ক্ষেপে।
কতনা আদরে কত মমতায়
বাসতে ভালো খুব
রাতের জোনাকি -মিটিমিটি তারা
দেখে হয়ে যেতো চুপ।
বোনটি আমার খুঁজি বারবার
প্রণতি জানাই তোমায়
শত আবদার-ভুলভাল চাওয়া
তবুও বেঁধেছো ক্ষমায়।

কাজী তানভীর আনজুম (মিরা)

ভালোবাসা
ভালোবাসার মানুষেরা
ভাল থাকুক সারাবেলা
হাঁসি কান্না ভালোবাসায়
ভরিয়ে দেবে সারাবেলা।
আমার আছে ভালোবাসা
নিত্য নতুন কথার মালা
ভালোবাসার মানুষেরা
ভাল থাকুক সারাবেলা।

ছড়া
লালপরী নীলপরী
পরীর দেশে যাই।
সেইখানেতে হরেক রকম
মিষ্টি-মনডা খাই।

শুভ সকাল।

শুভ সকাল।

শুভ সকাল।

মাহমুদা আঞ্জুমান

হেমন্ত লক্ষ্মী

শিশির ভেজা সকাল বেলা
পথের ধারে শিউলি হেলা
শরৎ চলে যায়।
নতুন ধান আর ফুলে ফলে
সাঁঝ কুয়াশায় জোনাক জ্বলে
হেমন্ত গো আয়।
আয় হেমন্ত লক্ষ্মী হয়ে
হিমের ঘন ঘোমটা লয়ে
ধূসর নয়ন ঢেকে।
ক্ষেত-খামারে সাধন ঝরে
চুপটি করে যাবে সরে
রূপ সজ্জা এঁকে।
রাশি রাশি ভারা ভারা
সোনার ফসল জুড়ায় পাড়া
পাখির কলতান।
কর্ম করে চাষী হেসে
মাঠে মাঠে বেড়ায় ভেসে
ভাটিয়ালির গান।
নদীর তীরে সোনা ছড়ায়
ঘরে ঘরে ফসল ভরায়
হেমন্তেরই দান।
কৃষাণ বধু স্বপ্ন দেখে
গোলা ভরা ধান যে রেখে
সুখে ভাসে প্রাণ।

ছড়া

ছন্দ নিয়ে দ্বন্দ্ব আসে
লিখতে বসে ভাবছি তাই
ছড়া লেখা নয়তো সোজা
তালটা তো ঠিক রাখা চাই।
ছন্দ লেখায় মন্দ আমি
রাত জেগে তাই বসে রই
আকাশ থেকে নামবে ছড়া
ভাবনাটা আজ কেমনে কই!
রাত দুপুরে ভাব বেড়ে যায়
নিঁদ আসে না যে চোখে
কানে কানে কেউ বলে যায়
যা লিখে তুই, কে রোখে।
ভালো ছড়া মাত্রা তালে
পড়তে যখন বেশ লাগে
শ্রান্ত দেহের ক্লান্ত মনে
তখন যেন সুখ জাগে।

পথ শিশু

আজ এই রিমঝিম ঘন বরষায়
শিশুর মুখখানা মনে পড়ে যায়।
পুরনো ময়লা ছিন্ন কাপড়
পড়েনি হয়তো মায়ের আদর।
অনাহারে ক্ষুধার্ত মলিন মুখটি
স্বপ্নিল দু'চোখে মায়া ভরা দৃষ্টি।
দু চারটা মালা যদি পারে বিলাতে
অন্ন জ্বালা পারিবে সে মিটাতে।
জনে জনে ঘুরে ফিরে হলো যখন বিফল
ইশারায় ডেকে বলি নিয়ে যাব সকল।
একে একে পুষ্পমাল্য নিলাম যখন তুলি
ওষ্ঠ কোণে ফুটে উঠে মিষ্টি মধুর হাসি।
পথের পাশে পড়ে থাকে এমন অনেক হাজার
হাসি আনন্দে দিন কাটাই আমারা খুব মজার।
আমাদেরও দায়িত্ব আছে ওদের তরে কিছু
দিতে হবে শিক্ষা দীক্ষা হটিনি যেন পিছু।
একজনে একটি করেও নেই যদি দায়িত্ব ভার
সৃষ্টি কুলে থাকবেনা আর অশিক্ষিতের হার।

হে মানুষ!

হে মানুষ !
তুমি সৃষ্টির সেরা
বিবেক তোমার উন্নত,
তুমি তবে কেন
পিপিলিকার চেয়েও অধম ?
দল বেধে পিপিলিকা করে
একে অপরের সাহায্য
শিখে নাও তুমি একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর মহত্ত্ব।
হে মানুষ !
তুমি শান্তি প্রিয়
অশান্তিকে করতে পার তুমি নাশ,
তুমি তবে কেন
হিংসার আগুনে চিতার আগুনকেও মানাও হার ?
যে আগুনে পুড়ে তুমি অঙ্গার
পূর্ব পুরুষের দীক্ষা ভুলে কর নিজেকে ছারখার।
হে মানুষ!
তুমি উদার
এক বুকে তোমার যেন প্রশস্ত এক মাঠ,
তুমি তবে কেন
কর রাহাজানি হানাহানি
কেন কর মানুষকে বিনাশ?
কর্মফল পিছু ছাড়বেনাতো আর
ঠিকানা চিনে ফিরে আসবে তোমার দ্বার।

হে মানুষ!
তুমি কোমল প্রাণ
মমতা তোমার অফুরান,
তুমি তবে কেন
গায়ের জোরে চল বার বার ?
যে শক্তির তোড়ে কর হীনতম কাজ
লাজে মরি আমি ভেবে আজ
সময় পরিয়ে দিবে তোমার মাথায় কলঙ্কের এক তাজ।

ভালেবাসা মানে

আচ্ছা, ভালোবাসা কি মুখে প্রকাশ করে বলার বিষয় !
একটা শিশুওতো উপলব্ধি করে
তাকে কে ভালেবাসে!
তবে প্রকাশ করে কি বুঝাতে চাও,,,,,,,,,,
বাসনা জাগে মনে ?
জানতো কামনায় প্রেম নষ্ট হয় আর
ত্যাগে সফলতা
পূর্ণতায় হারিয়ে যায়
দূরত্বে হয় গভীর।
কেমন ভালোবাসো আমায়
জানতে চাইনা আমি,
শুধরে দিব যত আছে ভুল
কাঁটাকে বানিয়ে ফুল।
হ্যাঁ, আমিই সফল করবো তোমায়
হেরে যাও তা চাইনা জেনো।
ভালোবাসা মানে শরীরে শরীরে কাছাকাছি আসা নয়
নয় পাশাপাশি থাকা
ভালোবাসা মানে হৃদয়ের টান,
দুটি মনের এক আত্মা !
তোমার যা তা শুধু তোমারই
তবে কেন এত মনে ভয় !
সন্দেহ সম্পর্কের ইতি টানে
আত্মবিশ্বাসে সফলতা।
ছায়া হয়ে থাকব পাশে
দেখবে দুনয়নে অশ্রু ভাসে
বুঝবে তখন আমি তোমার খুব কাছে
হৃদপিণ্ডের স্পন্দনে স্পন্দনে !

Sabila Rawshan

পাইনা খুঁজে

একলা একা নিঃস্ব আমি
পাইনা খুঁজে দুয়ার
হাতরে বেড়াই এদিক ওদিক
নিঃসঙ্গতা অপার!
শূন্য আমি চারদেয়ালে
অন্ধকারে একা
আলোর দিকে হাত বাড়ালেই
পথ চলে যায় আঁকাবাকা।

Mahabubur Rahim

ভাবনা চিন্তায় সারাক্ষন
অনুভবে অনুরননে অনুক্ষণ
প্রতিক্ষিত প্রতিক্ষায় প্রতিক্ষণ
নিভৃতে একাকিত্বে অন্তঃক্ষরণ
হৃদয় সিক্ত নিয়তঃ উচ্চারণ
ভালোবাসি ভালোবাসি আমরন

Kazi Saif Uddin Ratan

DOUBT

While birth doubts death,
There death smiles,
While dishonest doubts honest,
There honest cries,
While unkind doubts kind,
There kind outlaws,
While distrust doubts trust,
There trust tangles,
While Fool doubts scholar,
There scholar leaves,
While inhumanity doubts humanity,
There humanity dies,
While lout doubts man,
There the man confuses,
While insincerity doubts sincerity,
There sincerity exiles,
While untrue doubts true,
There true flees,
While bad doubts good,
There good disappears,
While dark doubts lights,
There lights dispel,
While sorrowness doubts happiness,
There happiness enlightens,
While the ass doubts horse,
There the horse compassions,
While wife doubts husband,
There the husband tricks,
While the subject doubts king,
There the king quits.

FAIR
Break the brick
Resist the trick,
Uncover the heed
Enter the reed,
Competents are mental
Intellects are rental,
Remove the stain
By Using the brain,
Some one is shrewd
Some one is Brut,
Events are on the click,
Tremendous actions are at the flick,
Hold the stick
Open the closed bleak.

THINKING
Hello! everyone dear,
Bothering no fear,
All the visions are in bloom,
There fugitives are at gloom,
Amusers are enged in abstract sports,
Tactfully be leaving the torts,
While the train is accrossing throughout watercourse(chalanbil),
The nature is almost serene,
Some small boats are floating in the river,
Mad winds are thrashing at the doors, windows,
Viewers are peeping in the window,
People are fishing, farmers are planting ,
All are waving at the mind,
Feelings are altogether in the mind,
Some are staying beside the mini zoo ,
The loving birds are singing, chattering the whole night,
Wining the faith, wining the breath,
Defeating the death, wining the birth,
Receiving the floral wreath,
Birds are singing song in the cadge,
Sleepless nights are gone by,
All the listeners are awaiting for the next rising,
Some are seeing, some are standing outside the home,
Some are sitting in the rail road side tea stall,and
Some are staring at the train.

ONCE
Once I fear snake,
Now I fear fake
Once I fear beast,
Now I fear feast,
Once I fear robber,
Now I fear cadre,
Once I fear liar,
Now I fear true teller,
Once I fear teacher,
Now I fear cheater,
Once I fear social maker,
Now I fear social leader,
Once I fear doctor ,
Now I fear factor,
Once I fear tiger,
Now I fear trigger,
Once I fear actor,
Now I fear traitor,
Once I fear administrator
Now I fear dictator,
Once I fear scholar,
Now I fear misinterpreter ,
Once I fear devil,
Now I fear civil,
Once I fear prostitute,
Now I fear institute,
Once I fear impure,
Now I fear pure,
Once I fear den,
Now I fear evil brain,
Once I fear dishonesty,
Now I fear honesty.

সৈয়দ আহসান কবীর

লাশ হতে কতো বাকি
অক্সিজেনহীন সমাজকফিন, কফিনের দেয়াল, দেয়ালের রঙ-
সবই আলোহীন, গন্ধবিহীন অথবা বিকট গন্ধময়
এরই মধ্যে পড়ে গড়ে ওঠা সেকি মানুষ, নাকি মানুষের অবয়ব?
.
মুখে কথা নেই, শব্দরা নিরব, নিথর হাত-পা, উরু
চোখ-মুখ-বুক, ধক্ ধক্ রব থেমে আছে স্তব্ধতায়।
বিবেক, আবেগ মরে গেছে আগেই- বসতি অন্ধকার
তবুও জীবন-ছায়াতলে মানুষ, নিভু বাতিঘর
সেঘরে তো আছে মানুষ! মানুষ; মানুষের চেহারা।
এই যদি হয় লাশ কাকে বলে, লাশ হতে কতো বাকি?

কলমের জবান খুলে দাও
শব্দকে কারারুদ্ধ কোরো না, কলমের জবান খুলে দাও
দেখবে- নরকের পথ ধরে পৃথিবীর হাঁটাপথে ফুল ফুটে আছে
দেখবে- নর্দমার পাশেও সুগন্ধী হাসনাহেনার ঠোঁটে লেগে আছে হাসি।
আশাবাদী হতে দোষ কী বলো? নিরাশায় আর কতোটা এগোবে-
এ পৃথিবী আমার (!) আমারই তো দোষ সব, তোমারও কিছু
মেনে নিতে হবে, মেনে নাও। আর কলমের জবান খুলে দাও।
.
এই যে এতো এতো মরলো, বন্ধ হলো কতো ফুসফুসযন্ত্র
ধর্মের নামে লাগানো হলো তকমা, ধর্মকেই সবাই গালি দিলো
অথচ কী ছিলো পেছনদরজার ইতিহাসে? কী ছিলো সে ইতিহাসের বিধেয়-
খুঁজে দেখলো সবাই, বুঝলো না কেউ। কেউ বললো না-
এই যে হ্যাকাহেকি, এই যে জনবিষ্ফোরণ- এই সবই অন্ধকারের
এই সবই রাজনীতিক-ষড়যন্ত্র; তাদেরই বিছানো জাল
তাই দফার নামে যা দেয়া হলো তাতে ছিলো না আলোর দাবি!
তাই কলুসিত হলো ধর্ম, নষ্ট হলো সম্প্রীতি, অভিশপ্ত হলো মহাকাল।
.
কী এক আশ্চর্য সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা,
কী এক মিরাকলে টিকে আছি আমরা!
.
অন্তত শব্দসাধকের বোঝা প্রয়োজন ছিলো, হাওয়ার উজানে হলেও
যুক্তিকে ছড়িয়ে দেয়া দরকার ছিলো অক্ষরে, পর্বে, মাত্রায়- অলঙ্কার-উপমায়।
কারণ, শব্দসাধকের ঘরের একজন হিসেবে আমি জানি-
বিশুদ্ধ শব্দতাপস কখনোই কক্সবাজারের রামুকাণ্ড চাই না;
রংপুরের গঙ্গাচড়া, সিলেটের ওসমানীনগর, কিংবা-
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর চাই না, চাই না-
যশোরের চাপাতলা-মালোপাড়ার মতো সহিংসতা।
তাই তারা কথা বলে কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, আলোচনায়
তারা শব্দকে কারারুদ্ধ রাখে না, কলমের জবান খুলে দেয়।
.
তুমি সাধক হলে-
শব্দকে কারারুদ্ধ কোরো না, কলমের জবান খুলে দাও
দেখবে- নরকের পথ ধরে পৃথিবীর হাঁটাপথে ফুল ফুটে আছে
দেখবে- নর্দমার পাশেও সুগন্ধী হাসনাহেনার ঠোঁটে লেগে আছে হাসি।

র.আমিন

হারিয়ে যায় আমাদের উত্তপ্ত বর্ণমালা,
নিয়ন আলোয় দেখি আহত 'অনুস্বর',
চেরাগ আলী দুরবীনে খোঁজে ভোরের সূর্য।

সতীকান্ত আর নেই কোলকাতায়,
'বাগধারা' ঘুমায় রাজপথে;
কবিতা আরো বিপদজ্জনক হয়;
গড়ে তোলো ধুমকেতুর নটরাজকে,
পূর্ণিমার চাঁদ খেয়ে ক্ষুধা মেটাই।
'মূর্ধন্য'কে আনবে বলে -
অজস্র প্রতিধ্বনি ভিড় করে,
একদিন গোলাপেরা কেঁদেছে;
পাশেই করতোয়া,
বয়ে যাওয়ার কর্তব্যে অচল।

কোন ফাগুনে ভাঙ্গা টেবিলের
'অব্যয়' নিঃশব্দে আর্তনাদ করে -
আমরা বিদ্রোহী, আমরা বন্দী,
আমাদের পথচলা বন্দী-বিদ্রোহে।

পথের পাশে এক উদ্ভ্রান্ত জননীর
শুকনো ঠোঁট দেখলাম
অভিশপ্ত প্রজন্মের চারটি চোখ ঘিরে আছে।

দুর্ভিক্ষ যখন প্রথম হানা দিয়েছিলো
তখনও চুয়াত্তরের বিক্ষোভ লাগেনি
একে একে বন্দী হল
শর্করা আর আমিষ কণিকা।

বিলাসী টেবিলের রজত জয়ন্তীতে
হাজার ক্ষুধারা হেঁটে চলে হাজার পথে।

ভালোবাসা দিবস
- উইকিপিডিয়া

ভালোবাসা দিবস বা সেন্ট ভ্যালেন্টাইন'স ডে, একটি বার্ষিক উৎসবের দিন যা ১৪ই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা এবং অনুরাগের মধ্যে উদযাপিত হয়। দিবসটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদযাপিত হয়ে থাকে, যদিও অধিকাংশ দেশেই দিনটি ছুটির দিন নয়। ২৬৯ সালে ইতালির রোম নগরীতে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন'স নামে একজন খৃষ্টান পাদ্রী ও চিকিৎসক ছিলেন। ধর্ম প্রচারের অভিযোগে তৎকালীন রোম সম্রাট দ্বিতীয় ক্রাডিয়াস তাকে বন্দী করেন। কারণ তখন রোমান সাম্রাজ্যে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। বন্দী অবস্থায় তিনি জনৈক কারারক্ষীর দৃষ্টিহীন মেয়েকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন। এতে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। আর তাই তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। সেই দিন ১৪ই ফেব্রুয়ারি ছিল। অতঃপর ৪৯৬ সালে পোপ সেন্ট জেলাসিউও ১ম জুলিয়াস ভ্যালেন্টাইন'স স্মরণে ১৪ই ফেব্রুয়ারিকে ভ্যালেন্টাইন' দিবস ঘোষণা করেন। খৃষ্টানজগতে পাদ্রী-সাধু সন্তানদের স্মরণ ও কর্মের জন্য এ ধরনের অনেক দিবস রয়েছে। যেমন: ২৩ এপ্রিল - সেন্ট জজ দিবস, ১১ নভেম্বর - সেন্ট মার্টিন দিবস, ২৪ আগস্ট - সেন্ট বার্থোলোমিজম দিবস, ১ নভেম্বর - আল সেইন্টম দিবস, ৩০ নভেম্বর - সেন্ট এন্ড্রু দিবস, ১৭ মার্চ - সেন্ট প্যাট্রিক দিবস।

পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে জন্মদিনের উৎসব, ধর্মোৎসব সবক্ষেত্রেই ভোগের বিষয়টি মুখ্য। তাই গির্জা অভ্যন্তরেও মদ্যপানে তারা কসুর করে না। খৃস্টীয় এই ভ্যালেন্টাইন দিবসের চেতনা বিনষ্ট হওয়ায় ১৭৭৬ সালে ফ্রান্স সরকার কর্তৃক ভ্যালেইটাইন উৎসব নিষিদ্ধ করা হয়। ইংল্যান্ডে ক্ষমতাসীন পিউরিটানরাও একসময় প্রশাসনিকভাবে এ দিবস উদযাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও জার্মানিতে বিভিন্ন সময়ে এ দিবস প্রত্যাখ্যাত হয়। সম্প্রতি পাকিস্তানেও ২০১৭ সালে ইসলামবিরোধী হওয়ায় ভ্যালেন্টাইন উৎসব নিষিদ্ধ করে সেদেশের আদালত। বর্তমানকালে, পাশ্চাত্যে এ উৎসব মহাসমারোহে উদযাপন করা হয়। যুক্তরাজ্যে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক প্রায় ১০০ কোটি পাউন্ড ব্যয় করে এই ভালোবাসা দিবসের জন্য কার্ড, ফুল, চকোলেট, অন্যান্য উপহারসামগ্রী ও শুভেচ্ছা কার্ড ক্রয় করে এবং আনুমানিক প্রায় ২.৫ কোটি শুভেচ্ছা কার্ড আদান-প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশেও বর্তমানে এই দিবস পালন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে তরুণ সমাজের কাছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির মিশ্রণে ভিন্নভাবে "বিশ্ব ভালোবাসা দিবস" নামে এটি পালিত হয়। বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বসন্ত উৎসব তথা "পহেলা ফাল্‌গুন" উদযাপিত হয়। তার ঠিক পরের দিনই ভালোবাসা দিবস পালন করা হয় বিধায় অনেকের কাছেই এই দিবসটি বেশ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। তবে কখনো কখনো অধিবর্ষের কারণে পহেলা ফাল্‌গুন এবং ভালোবাসা দিবস একই দিনে পালিত হয়। তখন বাংলাদেশের অধুনা তরুণ সমাজের কাছে আরও ভিন্ন উপায়ে উদযাপন করতে উৎসাহিত হয়। এই "ভালোবাসা দিবস" পালন করার আয়োজন হিসেবে সামাজিক গনমাধ্যম খুব বড় একটা ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ফুলের দোকান, ফ্যাশন হাউজ, উপহারএর দোকান, বেকারি ও ফাস্ট ফুড দোকানগুলোতে বিশেষ কিছু অফার চালু রাখে। তাছাড়া টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলগুলোতে "ভালোবাসা দিবসের গান", "ভালোবাসা দিবসের নাটক" ইত্যাদি প্রচারিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-"ক্লোজআপ কাছে আসার গল্প"। যেখানে ক্লোজআপ টুথপেস্ট ব্র্যান্ড হতে স্পন্সরকৃত তিনটি রোমান্টিক নাটক প্রচারিত হয়। এই নাটকের মূলগল্পগুলো মূলত সাধারণ জনগণ বা দর্শকেরা নিজেরাই লেখেন, এর মধ্যে মনোনীত তিনটি গল্পের আলোকে এই নাটকগুলি নির্মিত হয়। এই আয়োজনটি দর্শকমহলের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তবে ভালোবাসা দিবস পালনের জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র তরুণ সমাজের কাছেই সীমাবদ্ধ নয়, এই ভালোবাসার উৎসবে সব বয়সের শ্রেণী-পেশার মানুষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাই পরিবারের সদস্যদের সাথে এবং সমলিঙ্গের বন্ধুদের সাথেও উৎসবের আনন্দ ভাগাভাগি করেন অনেকেই।

'বনলতা সেন' আসলে কে ছিলেন?

লীনা দিলরুবা | 9 MAY , 2017
https://arts.bdnews24.com/?p=12090

জীবনানন্দ দাশ-এর লেখা সুবিখ্যাত কবিতা 'বনলতা সেন' সম্ভবত কবির চেয়েও জনপ্রিয়। এ কবিতাটি নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কোনো শেষ নেই। কবিতার বনলতা সেন নাম্নী এই নারী কে, এ-নিয়ে মানুষের খোঁড়া যুক্তি আর নানান অনুমানের বহু উদাহরণ এ-পর্যন্ত দেখা গেছে। তবে এ-কবিতা সম্পর্কে সম্ভবত সবচেয়ে বিতর্কিত এবং ভব্যতাবর্জিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন আকবর আলি খান। তাঁর *পরার্থপরতার অর্থনীতি* বইতে "লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অর্থনীতি" শিরোনামের প্রবন্ধে তিনি বনলতা সেনকে বিনোদবালা বলে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৬৮-৬৯ সালে তিনি রাজশাহীতে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিসেবে চাকুরীরত অবস্থায় পেশাগত কাজের তাগিদে পনের দিনের জন্য নাটোর গিয়েছিলেন। তাঁর ভাষ্যমতে, সরকারি কর্মকর্তাদের কাজের পরিমাণ যেহেতু কম, তাই তিনি আর কি করবেন, ভাবলেন নাটোর যেহেতু এসেছি জীবনানন্দের বিখ্যাত কবিতার চরিত্র নাটোরের বনলতা সেনকে নিয়ে একটু গবেষণা করে যাই। প্রচলিত গল্প রয়েছে, বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলার লোকেরা মামলা করতে খুবই পছন্দ করে। তারা নাকি বলে, গঞ্জে যখন এসেছি, চাচার নামে কেসটা করেই যাই। আকবর আলি খানের যেন হয়েছিল সেই দশা।

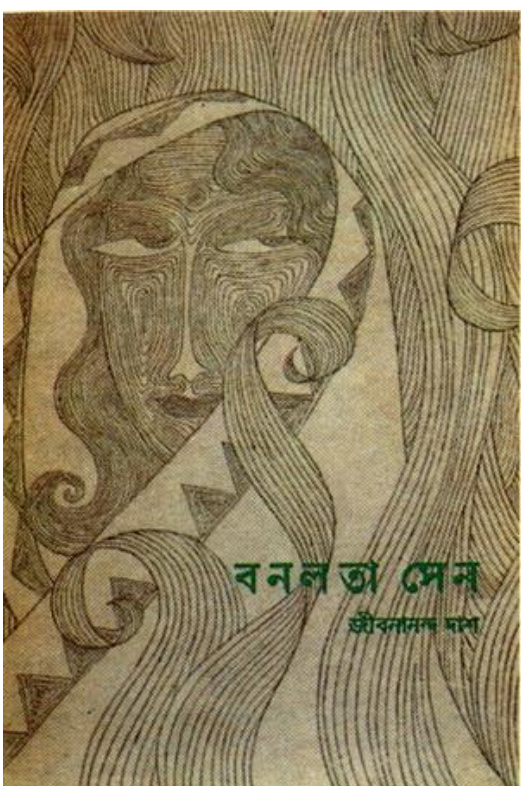

তিনি সম্ভবত ভেবেছেন, নাটোরে যখন এলুম, জীবনানন্দের কবিতার রহস্যময় এই নারীর এসপার-ওসপার করেই যাই। মহকুমা প্রশাসনের Notes to Successors বা উত্তরসূরীদের অবগতির জন্য রক্ষিত স্মারক ঘেঁটে আকবর আলি খান দেখলেন, নাটোরে উত্তরবঙ্গের রূপোপজীবীদের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। নাটোরের বারবিলাসিনীরাই উত্তরবঙ্গে বড় বড় জমিদারদের দু দণ্ডের শান্তি দিতেন। আকবর আলি খানকে আর পায় কে! তিনি দারুণ খনি পেয়ে গেছেন।

তিনি জানাচ্ছেন-
"বনলতা সেন পরিচয় কবিতাটিকে একটি সম্পূর্ণ নতুন দ্যোতনা দেয়। কেন আমরা বুঝতে পারি, বনলতা সেন কেন কবিকে 'দু'দণ্ডের শান্তি' দিয়েছিল, বুঝতে পারি কেন কবির অভিসার 'নিশীথের অন্ধকারে' এবং 'দূর দূরান্তরে'। এ পটভূমিতে দেখতে গেলে, এতদিন কোথায় ছিলেন' একটি সাধারণ প্রশ্ন নয়। বনলতা সেন যেন বলতে চাচ্ছে যে, সে ইচ্ছা করে রূপজীবার বৃত্তি গ্রহণ করে নি, তার জীবনে অনেক ঝড় ঝঞ্ঝা গেছে, সে দুঃসময়ে তার পাশে কেউ ছিল না। 'এতদিন কোথায় ছিলেন' একটি

সৌজন্যমূলক প্রশ্ন নয়, এ হচ্ছে বিপর্যস্ত নারীত্বের আর্তনাদ। বনলতার পরিচয় পেলেই আমরা বুঝতে পারি কবি কেন কবিতার শেষে বলেছেন 'সব পাখি ঘরে ফেরে'। বনলতাদের সাথে দু'দণ্ড সময় কাটালেও শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দদের (বিবাহিত পুরুষদের) লাবণ্যপ্রভাদের (স্ত্রীদের) কাছে ফিরে আসতে হয়। বনলতাকে আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীতে প্রকাশ্যে পাওয়ার সুযোগ নেই। বনলতার কথা কাউকে বলারও উপায় নেই। বনলতাকে নীরবে নিভৃতে স্মরণ করতে হয় অপরাধবোধ নিয়ে। তাই কবি বলেছেন, 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।' এ অন্ধকার প্রাকৃতিক নয়, এ অন্ধকার মানসিক। আমার জানামতে নিষিদ্ধ প্রেমের আনন্দ ও বেদনা এত সুন্দরভাবে আর কোন কবি ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।" (লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অর্থনীতি, *পরার্থপরতার অর্থনীতি*, আকবর আলি খান, পৃষ্ঠা-৮২)।

তিনি আরো লেখেন-

"প্রশাসকদের দলির দস্তাবেজ হতে দেখা যায় যে, এ শতাব্দীর প্রথম দিকে নাটোর শুধু কাঁচাগোল্লা বা জমিদারদের জন্য বিখ্যাত ছিল না, নাটোর ছিল উত্তর বঙ্গের রূপাজীবাদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। আমার মনে হয় 'নাটোর' শব্দটির দ্বারা তার পেশা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে দেখলে বনলতা সেন নামটির তাৎপর্যও সহজে বোঝা যায়। সেন পদবী ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, সে ভদ্রবংশ উদ্ভূত। বনলতা বাংলাদেশে ব্যবহৃত কোন সাধারণ নাম নয়। তার স্খলনের পর নিজের পরিচয় লুকানোর জন্য সে হয়ত ছদ্মনাম নিয়েছে।"

<u>বনলতা সেন</u>

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।
চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতোদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।
সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

....

আকবর আলি খানের এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক মোঃ আবু তাহের মজুমদার তাঁর 'জীবনানন্দ' নামক গ্রন্থে বনলতা সেন নামের এক নিবন্ধে বনলতা সেন সম্পর্কিত আকবর আলি খানের গবেষণা কাজকে বিরক্তিকর, স্থূল, দূরান্বয়ী, এবং নান্দনিক ধ্যানধারণা-বিযুক্ত বলে মতামত দেন। আবু তাহের মজুমদার তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে বারোটি পয়েন্ট তুলে ধরে বিশ্লেষণ করেন।

১.জীবনানন্দ পদস্খলনের পূর্বেকার বনলতা সেনকে চিনতেন, কিন্তু বহুদিন আর তার কাছে যাননি; পরে যখন যান তখন তার পদস্খলন হয়ে গেছে; তাই প্রশ্ন 'এতদিন কোথায় ছিলেন?', আপনি আসলে তো আর আমার পদস্খলন হতো না, আমি রূপাজীবা হবার অধঃপতন থেকে রক্ষা পেতাম;

২.জীবনানন্দ কি তাকে প্রেমিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা রাখতে দেরি হলো বলে বনলতা সেন এখন দুর্ভাগ্যের শিকার;

৩.এসবের একটা মানে হলো জীবনানন্দ বরিশাল থেকে নাটোর যাতায়াত করেছেন এবং এর কোন এক পর্যায়েই বনলতা সেনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, তখনও তার অধঃপতন হয়নি, ও পরে, অধঃপতনের পর খবর সংগ্রহ করে, তিনি নাটোরের নিষিদ্ধ পল্লীতে গিয়ে তাকে খুঁজে বের করেই ক্ষান্ত হননি তার সঙ্গে দৈহিকভাবেও মিলিত হয়েছেন আর এসব কিছুই হয়েছে অন্ধকারে;

৪.নাটোরে রূপাজীবাদের এই বড় কেন্দ্রটি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল বলেই জীবনানন্দ তাকে অন্ধকারেও খুঁজে পেয়েছিলেন এবং দু'দণ্ডের শান্তিতে অভিষিক্ত হয়েছিলেন অর্থাৎ 'এতদিন কোথায় ছিলেন' বলেই আর্তনাদ করে বনলতা সেন কালবিলম্ব না করে নিজেকে নিবেদন করেছেন;
৫.জীবনানন্দ কি দু'দণ্ডের শান্তির বিনিময়ে বনলতা সেনকে কোন সম্মানী দিয়েছিলেন, নাকি পূর্বপ্রেম বা পরিচয়ের কারণে বনলতা সেন শান্তির বিনিময়ে কোন সম্মানী গ্রহণ করেন নি? কিন্তু গ্রহণ না করলে তার চলবে কি করে? তাছাড়া;
৬.পথ খরচ দিয়ে আবার বনলতাকে দেবার মত টাকা জীবনানন্দ কোথায় পেলেন? তিনি তো সারাজীবনই দারুণ অর্থকষ্টে ছিলেন;
৭.নাটোর গিয়ে থাকলে কখন গিয়েছিলেন? বিয়ের কতদিন পর? বাসায় বা লাবণ্যকে কি কারণে যাচ্ছেন বলে অবহিত করেছিলেন;
৮.জীবনানন্দের নাটোর যাওয়ার উল্লেখ কোথাও নেই কেন?
৯.নিশীথের অন্ধকার নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক, প্রবন্ধকারের মত গ্রহণ করলে বা মেনে নিলে তা মানসিকও; বিদ্যুৎহীন (তখন নাটোরে বিদ্যুৎ ছিল না) কৃষ্ণপক্ষের রাত ঘন অন্ধকার, কেরোসিনের আলোতে তা উজ্জ্বল হয় না; জীবনানন্দের অভিসার নিশীথের অন্ধকারে হয়ে থাকলে অন্ধকার প্রাকৃতিক, তার কোন লেখাতে এ পর্যন্ত এ ধরনের কোন মানসিক অন্ধকারের ছাপ পরিলক্ষিত হয়নি;
১০.প্রবন্ধকারের মতামত মেনে নিলে এ কথাও মেনে নিতে হবে যে জীবনানন্দ বনলতা সেনকে দেখেছেন, তার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং পরে তার মুখোমুখি বসেছেন কেরোসিনের বাতির বা হারিকেনের আলোয়; এ কারণেই বনলতা সেনের বর্ণনা অস্পষ্ট; লাবণ্য দাশ কি বনলতা সেন সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত ছিলেন? নাকি জেনেও কখনো উচ্চবাচ্য করেননি?
১১.বনলতা সেন কবিতায় অপরাধবোধ খুঁজতে যাওয়া একটি ব্যর্থশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ এ ধরনের কোন বোধের লেশমাত্রও কবিতাটির কোন ছত্রে বা শব্দে আভাসিত বলে মনে হয় না;
১২. জীবনানন্দ দীর্ঘ যাত্রা শেষে প্রাক-উষালগ্নে বনলতা সেনকে দেখেন, দিনটা কাটে সম্ভবত তার সঙ্গেই এবং সন্ধ্যার পর দুজনে আবার মুখোমুখি বসেন; সব পাখি ঘরে ফিরলেও জীবনানন্দ কিন্তু ঘরে ফেরার ভাবনায় কাতর নন, বরং ধীরে সুস্থে বনলতা সেনের মুখোমুখি বসেন; কাজেই প্রবন্ধকার বিবাহিত পুরুষদের ঘরে ফেরার যে কথা বলেছেন তা অপ্রাসঙ্গিক এবং নিষিদ্ধ প্রেমের যে আনন্দ ও বেদনার কথা বলা হয়েছে তাও অপ্রাসঙ্গিক। মোটকথা, বনলতা সেন একজন রূপাজীবা এ ধরনের বিবেচনা শুধু বিতর্কমূলকই নয়- বিভ্রান্তকর বলেই মনে হয়।
(বনলতা সেন, *জীবনানন্দ*, মোঃ আবু তাহের মজুমদার, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৫)।
আবু তাহের মজুমদারের নিজের ব্যাখ্যা হল, বনলতা সেন আসলে বরিশালের ভদ্র ঘরের মেয়ে। তাঁর বর্ণনা জীবনানন্দের *কারুবাসনা* উপন্যাসে রয়েছে। তিনি ছিলেন জীবনানন্দের পাশের বাড়ির একজন নারী।
আবু তাহের মজুমদারের এ-লেখার পর আকবর আলি খান আবার কলম ধরেন। এবার ছোটখাট নয়, বিশদভাবে, আগের চেয়ে শানিত কলমে তিনি তাঁর লেখা *অন্ধকারের উৎস হতে* বইতে "অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো : নতুন আলোকে বনলতা সেন"-এর মাধ্যমে মোঃ আবু তাহের মজুমদারের যুক্তিগুলো যে ভুল, তিনিই যে সঠিক সেটি পুণরায় পুরনো সেই অনুমাননির্ভর যুক্তি এবং নতুন আরও কিছু যুক্তি দিয়ে তুলে ধরেন। পূর্বের বক্তব্য সেই একই, অর্থাৎ, বনলতা সেন একজন বারবণিতা এবং দু'দণ্ড শান্তির খোঁজে জীবনানন্দ তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। নতুন অনুধাবনগুলো আরও বিভ্রান্তিকর। এ-বার তিনি বনলতা সেন কবিতার তাৎপর্যভিত্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। সেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আমরা যাব না। সেটি উদ্ভট এবং সময় নষ্টকারী। কবিতা পড়ে সেটির রস গ্রহণ করাই পাঠকের দায়িত্ব। অপরের মুখে ঝাল খেয়ে কবিতা বুঝতে যাওয়ার প্রয়োজন দেখি না। সেই লেখায় তিনি অন্য যারা এই কবিতা নিয়ে নানান অনুধাবন রেখে গেছেন সেটিরও সমালোচনা করেন। মোটকথা, তিনি যা বলেছেন সেটিই সঠিক। বাকীদের পঠন এবং গবেষণার কোনো মূল্য নেই।

মৃত্যুর ঠিক এক বৎসর আগে ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে নয়া দিল্লীর রাজঘাটে তোলা হয়েছিল এই চিত্রটি। কবি তখন দিল্লী বেড়াতে গিয়েছিলেন। কবির সংগে কবিপত্নী, কন্যা, পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র।

জীবনানন্দের জীবনীকারদের বরাতে আমরা বলতে পারি, জীবনানন্দ দাশ কখনো নাটোর যান নি। বরিশালের বাইরে তিনি কেবলমাত্র ১৯২৯ সালে বাগেরহাট জেলায়, (তৎকালীন খুলনা জেলা, বাগেরহাট মহকুমা) প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে মাস তিনেক চাকুরী করেছিলেন। আকবর আলি খানের কথা হচ্ছে, দিল্লীতে তিনি বেপাড়ায় গেছেন এরকম উদাহরণ যেহেতু রয়েছে, সেহেতু তিনি বাংলাদেশেও এ-কাজ করে বেড়িয়েছেন। এবং সেটা নাটোরেই। কারণ, কবিতায় লেখা আছে, নাটোরের বনলতা সেন তাকে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল। জীবনানন্দ জীবনে কোনোদিন বাইরের কোনো দেশে ভ্রমণ করেন নি, কিন্তু তিনি বিশ্বভূগোল ঘুরে দেখার মতো প্রচুর শব্দ তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন। তাহলে কী তর্কের খাতিরে আমরা বলবো, এসব জিনিস তিনি যেহেতু লিখেছেন, সম্ভবত দেশগুলো তিনি ভ্রমণ করেছিলেন।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এতসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এসব জ্ঞানী লোকেরা যে করলেন, তাঁরা কী বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অশোক মিত্রের বনলতা সেন বিষয়ক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণগুলো অনুসরণ করেছিলেন? অশোক মিত্র স্বয়ং জীবনানন্দের ভাষ্যে বনলতা সেনের পরিচয় সংক্রান্ত একটি ইঙ্গিত রেখে গেছেন। এ সংক্রান্ত আলোচনা অশোক মিত্র তাঁর জীবনীগ্রন্থ *আপিলা চাপিলা*তে স্বল্প পরিসরে বিবৃত করে অন্যত্র এ নিয়ে গোটা একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধের নাম “বনলতা সেন।” বনলতা সেন কবিতার পঁচাত্তর বছর পূর্তিতে অশোক মিত্র লিখেছেন, “এক নিভৃত সন্ধ্যায় জীবনানন্দের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম, বনলতা সেন নামটি কবিতায় ব্যবহারের জন্য তাঁর কী করে মনে এল; সেইসঙ্গে এটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, কবিতাটির অন্তঃস্থিত অন্ধকারের প্রসঙ্গ তাঁর কি আগে থেকেই ভাবা ছিল, না কি বনলতা সেন নামটি বেছে নেওয়ার পর কবিতাটি নিজের নিয়তি নির্ধারণ করেছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের কোনও জবাব পাইনি। জীবনানন্দ শুধু জানিয়েছেন, সেই সময় আনন্দবাজার পত্রিকায় মাঝে মাঝে নিবর্তক আইনে বন্দিরা কে কোন কারাগারে আছেন, বা কোন জেল থেকে কোন জেলে স্থানান্তরিত হলেন, সে-সমস্ত খবর বেরোত। হয়তো ১৯৩২ সাল হবে, নয়তো তার পরের বছর, বনলতা সেন নাম্নী এক রাজবন্দি রাজশাহি জেলে আছেন, খবরটা তাঁর চোখে পড়েছিল, রাজশাহি থেকে নাটোর তো একচিলতে পথ। ইতবৃত্তের এখানেই শেষ। প্রাকস্বাধীনতা যুগে রাজবন্দিনী সেই মহিলা পরে গণিতের অধ্যাপিকা হয়েছিলেন, কলকাতার কলেজেও পড়িয়েছেন। বিবাহোত্তর পর্বে অন্য পদবি ব্যবহার করতেন, তাঁর সামান্য আলাপ হয়েছিল। ভব্যতাবশতই জিজ্ঞেস করা হয়নি তিনি কবিতাটির সঙ্গে আদৌ পরিচিত কি না। কিছু কিছু রহস্যকে অন্ধকারে ঢেকে রাখাই সম্ভবত শ্রেয়। (পৃ:-৫, বনলতা সেন/বিক্ষিপ্ত অর্ধশতক/অশোক মিত্র)

যেখানে কবি স্বয়ং বনলতা সেন কে ছিলেন, সেটি নিয়ে নিজের খানিকটা মতামত দিয়ে গেছেন সেখানে কবিতার এই চরিত্রটি নিয়ে আকাশকুসুম কল্পনা করার বিষয়গুলোর অবসান উচিত। জীবনানন্দ-তো এই কবিতায়, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে-মালয় সাগরে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে ঘুরে এসেছেন। তাহলে কী আমাদের ভাবতে হবে তিনি সে-সময়েরই মানুষ আসলে, ভুল করে আমরা ভাবছি জীবনানন্দ আমাদের কালের কবি।

আকবর আলি খান তাঁর পরের বইটিতে, অর্থাৎ, *অন্ধকারের উৎস হতে* বইতে এক জায়গায় লিখেছেন, বনলতা সেন সম্পর্কে কবি নীরব: এই অংশে আকবর আলি খান বলতে চেয়েছেন, এ কবিতা নিয়ে জীবনানন্দ নিজে কোনো বক্তব্য দেন নি। এ কবিতাটি নিয়ে নানা ভুল ধারণার সৃষ্টি হলেও তিনি সেটি অপনোদনের চেষ্টা করেন নি।

বোঝা যাচ্ছে, বনলতা সেন চরিত্রটি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এসব লেখকরা ঠিকভাবে খোঁজ খবরও করেন নি, কিন্তু তিনি করেছেন! আকবর আলি খানের *অন্ধকারের উৎস হতে* প্রকাশিত হয়েছে ২০১১ সালে, অশোক মিত্রের আপিলা চাপিলা প্রকাশিত হয়েছে ২০০৩ সালে। এবং ২১ ডিসেম্বর ২০১০ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় অশোক মিত্রের 'রাজশাহি জেলে বন্দি ছিলেন এক বনলতা সেন' নামে যে লেখাটি প্রকাশিত হয় সেটি অশোক মিত্র বনলতা সেন কবিতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে লিখেছিলেন, যেটি আগেই বলা হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশ সারাটি জীবন দারুণ অর্থকষ্টে ছিলেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে কবিতা পাঠিয়ে বা পাঠাবার সময় টাকা চেয়ে নানান অনুনয় করে চিঠি লিখতেন। টাকার জন্য ছদ্মনামে উপন্যাস ছাপানোর কথাও একবার বলেছেন। জীবনের লম্বা একটা সময় বেকার থেকেছেন। সারা জীবনে সাতটি কলেজে স্বল্প বেতনে অনিয়মিতভাবে উনিশ বছরের মত শিক্ষকতা পেশায় জড়িত থাকতে পেরেছেন। এরকম একজন মানুষ বারবণিতাদের পেছনে টাকা ঢালার কথা চিন্তা করতে পারেন এটা যারা ভাবতে পারে তারা আসলে মহান। এই মহান লোকেরা জীবনানন্দের চরিত্র কলঙ্কিত করার মিশনে নেমেছেন। এরা সজনীকান্ত দাস-এর মত লোকদের চাইতেও অধম। সজনীকান্ত-তো শেষে 'মানুষ' হয়েছিলেন।

আশা করি দেরিতে হলেও আকবর আলি খান তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেবেন। সেই সঙ্গে প্রত্যাশা থাকবে, শুদ্ধ-সুন্দর কবি জীবনানন্দ দাশ বিষয়ে কারো মনে অশোভন এবং বিকৃত ভাবনা যেন জাগ্রত না হয়। সবার মনে শুদ্ধচিন্তা বহমান থাকুক।